খেয়া

২৬ বর্ষ ২ সংখ্যা ৫২ সংকলন

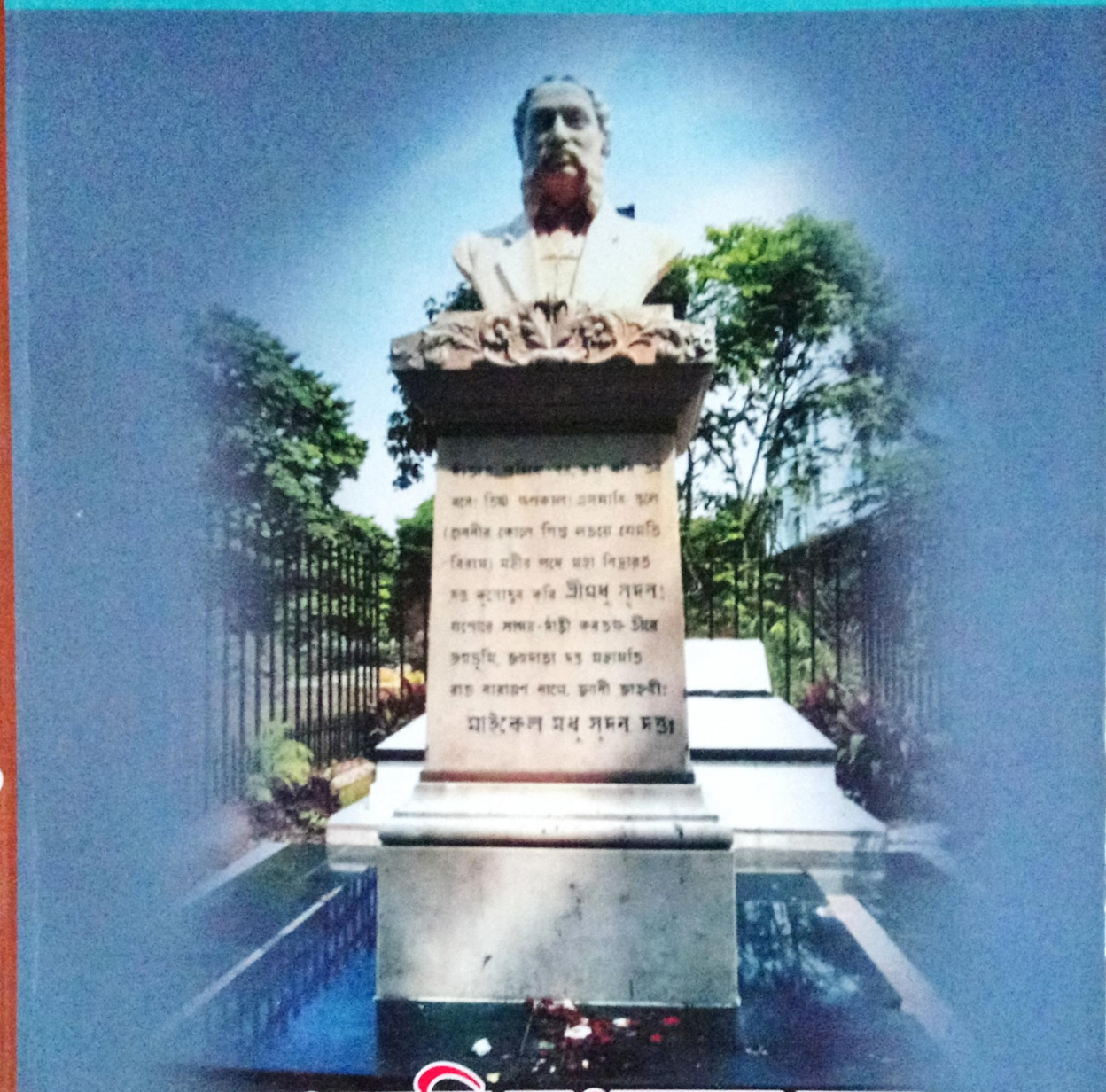

মধুকবি মধুসূদন দত্ত

ও

অন্যান্য

সূচিপত্র

❐ *সম্পাদকীয়* ৭

❐ *প্রচ্ছদ প্রবন্ধ*

কালের নক্ষত্রনির্দেশ, বাংলা মহাকাব্য ও শ্রী মধুসূদন
সুশান্ত চক্রবর্তী ৯

একটি জন্মদ্বিশতবর্ষ আর একজোড়া বাংলা প্রহসন
শুভ জোয়ারদার ১২

মহাকবি মধুসূদন দত্তের শোচনীয় মৃত্যু ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
অবশেষ দাস ১৯

গল্পকথায় মহাকবি শ্রীমধুসূদন
শশাঙ্কশেখর মৃধা ২৫

মধুসূদন
ভগীরথ মাইতি ২৮

❐ *অন্যান্য প্রবন্ধ*

দারুময়ী দুর্গা
দেবপ্রসাদ পেয়াদা ৩১

প্রাচীন জনপদ সীতাকুণ্ড : প্রত্নবস্তু, ঐতিহ্য ও সমীক্ষা
বিশ্বজিৎ ছাটুই ৪৩

সিন্ধুসভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতা
ড. দেবব্রত নস্কর ৪৯

'রানী'রঙে রাঙা মেয়েপুতুল : প্রেক্ষাপট দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
শুভঙ্কর মণ্ডল ৫৬

ডোকরা রূপান্তর
মৃণালকান্তি গায়েন ৬১

দিদিমা-ঠাকুমার মুখে শোনা একগুচ্ছ প্রবাদ
ভোলানাথ মণ্ডল ৭০

বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের হরিচন্দন : হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন
অলোককুমার শর্মা ৭৯

❑ *চেনা মানুষের অচেনা কথা*
সাহিত্যিক প্রত্নতাত্ত্বিক পরিমল চক্রবর্তী / রামচন্দ্র নস্কর ৮৪
❑ *ব্যক্তিগত গদ্য*
লেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, উপাধি ইত্যাদির উল্লেখ :
দু-একটি ভাবনা / অরবিন্দ পুরকাইত ৮৭
❑ *ধারাবাহিক আলোচনা*
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের কথ্য আঞ্চলিক ভাষার
সাহিত্য পর্যলোচনা/প্রদীপকুমার বর্মণ ৯১
❑ *কবিতা*
মিথ্যে অবয়ব/জয়দীপ চক্রবর্তী ১০০
অসীমের ঘেরাটোপে/কেতকী বসু ১০০
উঠে আসে জীবন/শ্যামলকুমার প্রামাণিক ১০১
তাদের কথা/মানস চক্রবর্তী ১০১
চরকাকাটা মেঘের বুড়ি/রামকুমার সরদার ১০২
ছায়াপাখি/রামকুমার সরদার ১০২
যদি/জ্যোতির্ময় সরদার ১০৩
স্বপ্ন থাকে/শম্ভু মণ্ডল ১০৪
❑ *ইতিহাস আশ্রিত গল্প*
বাসন্তিকা কমলা কালিদাস/অতীতা অধিকারী ১০৫
❑ *গল্প*
বাতাসীর গামছা/মায়ারানী সরদার ১১৭
সুবল কাওরার শখের দল/নিরঞ্জন মণ্ডল ১২২
বৃষ্টির সেই রাত/অনিমেষ দাস ১২৫
বোধোদয়/রতনচন্দ্র সরদার ১২৯
উইল রহস্য/সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ১৩৯
এবেলা তালি দুগ্গোপুজো আংগার/মদনমোহন মাহাতা ১৫৮
❑ *অনুগল্প*
বড় ডাক্তার, লাইব্রেরি/কালিদাস হালদার ১৫৮
❑ *ধারাবাহিক*
জলযানের শব্দকোষ (দ্বিতীয় পর্ব) /পূর্ণেন্দু ঘোষ ১৫৯

মহাকবি মধুসূদন দত্তের শোচনীয় মৃত্যু ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

অবশেষ দাস

মধুকবি জন্মেছিলেন, কপোতাক্ষ নদের স্নিগ্ধতা মাখা কেশবপুরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে। যশোর জেলা সদর থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সাগরদাঁড়ির বিখ্যাত দত্তবাড়ির বর্তমান নাম মধুপল্লী। দত্তবাড়ির পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বালিতে। মধুসূদনের পিতামহ রামনিধি দত্ত সাগরদাঁড়িতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সাগরদাঁড়ি সংলগ্ন কপোতাক্ষ নদের প্রতি গভীর অনুরাগে মধুকবি একদিন লিখেছিলেন–

"বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"

ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে সেই যশোর জেলা অধুনা বাংলাদেশের মানচিত্রে আলো ছড়াচ্ছে। স্বনামধন্য জমিদার রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান মধুসূদন জন্মেছিলেন, ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি। তিনি পৃথিবীতে ক্ষণকালের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু চিরকালের কবি হয়ে তাঁর আগমন ঘটেছিল। নবজাগরণের সূর্যোদয়ের কবি মধুসূদন মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছরের জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আবর্তন করলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনে সর্বোত্তম ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় যুগান্তকারী আলোড়ন ঘটিয়ে তিনি মহাকবির শিরোপা লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার মায়াজাল কত গভীর ও প্রশস্ত তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। তাহলেও মধুসূদনের অনন্ত সৃজনগন্ধপ্রতিভার অভিমুখ দীর্ঘসময় জুড়ে কর্তৃত্ব করলে ঠিক কতদূর বিস্তৃত হত, কল্পনার মায়াজালে তা জরিপ করা অসম্ভব বলে মনে হয়।

শ্রীমধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন, ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি। তাঁর এই সিদ্ধান্ত রক্ষণশীল সমাজ মেনে নিতে পারেনি। তিনি অবিলম্বে দত্ত পরিবার থেকে ত্যাজ্য পুত্র হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। বহুমুখী সৃজন প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের ক্ষুরধার কলমের ডগায় একের পর এক সোনার ফসল ফলেছে। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবির শিরোপা তাঁর প্রতিভার স্বর্ণ মুকুটে জ্বলজ্বল করছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা। একাধারে তিনি প্রথম সনেট রচয়িতা, প্রথম সার্থক নাট্যকার, প্রথম পত্রকাব্য রচয়িতা, প্রথম সার্থক প্রহসন রচয়িতা ও প্রথম সার্থক কমেডি রচয়িতা। এছাড়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আশ্চর্য প্রতিভার নজির স্থাপন করেছেন। বাংলা সনেটের জনক হিসেবে তিনি সনেটের নতুন নামকরণ করেছেন, চতুর্দশপদী কবিতা। তাঁর সনেট সংকলনে মোট ১০২টি সনেট সংকলিত হয়েছে। যা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। গ্রিক কবি হোমারের 'ইলিয়ড' অবলম্বনে

তিনি রচনা করেছেন, কালজয়ী 'হেক্টরবধ' কাব্য (১৮৭১)। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল–'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)। পাশাপাশি তাঁর কালজয়ী নাটকগুলো হল– 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) ও 'মায়াকানন' (১৮৭৪)। ইংরাজি কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ নাটক ও অন্যান্য রচনাতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষণকালের জীবদ্দশায় তিনি চিরকালের রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিয়ে গেছেন।

মধুসূদনের জীবন পরিক্রমায় বারবার উঠে এসেছে যশোর, কলকাতা, মাদ্রাজ, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কথা। তাঁর জীবন ছিল মহাকাব্যিক উপন্যাসের মতো বর্ণময়। তিনি কখনও যাযাবর, কখনও সংসারী। আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশ দ্বিধাশূন্য ভাবে ত্যাগ করলেও তিনি কপোতাক্ষ নদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কখনও ত্যাগ করতে পারেননি। আবাল্য গভীর সম্পর্ক তিনি ধরে রেখেছিলেন জীবনের কানায় কানায়। সে প্রমাণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়। আর সেজন্যেই হয়তো শেষপর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সাফল্য ও ব্যর্থতার কুয়াশা ভেদ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আকাশে একের পর এক কালজয়ী দীপ জ্বেলে উনিশ শতকের বাঙালি মনীষাকে বিস্মিত করেছিলেন। সেই বিস্ময় আজও সমানভাবে প্রাণিত করে। দেখতে দেখতে তাঁর জন্মের দুই শতবর্ষের দোর গোড়ায় আমরা চলে এলাম। তিনি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি আজও বহু পঠিত ও বহু চর্চিত এক অধ্যায়।

প্রতি বছর জুন মাস এলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর কবি মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকীর গভীর আবহ তৈরি হয়। অমনোযোগী বাঙালি খেয়াল করে না, কখন চলে যায় তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন। আড়ালে আবডালে দু-চারটে উদযাপন হলেও তা ঠিক মতো গোচরে আসে না। ভয়ঙ্কর এই উদাসীনতা কখনোই সমর্থন করা যায় না। ভারতবর্ষ যদি হাতেগোনা দু-চারজন কবির কথা হৃদয়ে রাখে, তাহলেও মধুকবি উপেক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু কোথায় যেন একটা অবক্ষয়ের দামামা বেজে চলেছে। মধুকবিও যেন বিস্মৃতদের গ্রহে একটু একটু করে ঢুকে পড়ছে। পাঠ্যসূচির মধুসূদন সরিয়ে দিলে বাংলার আকাশে বাতাসে কোথাও যেন তাঁর অবদানের বন্দনা শোনা যায় না। সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে মধুসূদন মঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। কেবলমাত্র একটি প্রেক্ষাগৃহ। টিমটিমে আলোর মতো ক্ষীণকায়া হয়ে যাচ্ছে, এই মহাজ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব। অথচ অমন অপ্রতিরোধ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই প্রতিভার বন্দনা প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে বিশ্বাস করি।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের অন্তিম দিন। তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি অত্যন্ত করুণভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যথার্থ যুক্তিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুরেই তাঁর অল্পদিনের জীবন-নদী মোহনা খুঁজে পায়। তাঁর জীবনের অজস্র অধ্যায়ের কথা বলতে বলতে গেলে বিভিন্ন স্থানের কথা উঠে আসে। দক্ষিণের সদর আলিপুরের কথা তেমনভাবে উঠে আসে না। ইতিহাসের

আলোআঁধারিতে আলিপুরের নাম যে কতভাবে উঠে এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাপরিক্রমার পূর্ণাবসান এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুরে। বলাবাহুল্য, গৌরবময় ইতিহাসের এই আন্তরিক দায়িত্ববোধ দক্ষিণের আলিপুরের মহান্তি মাটিকে আলাদা সম্ভ্রম ও মর্যাদা দিতে বাধ্য।

মধুকবির বার্ধক্যের একখণ্ড বারাণসী এই আলিপুর, কবির চির শান্তিযাত্রার শুভ সূচনা এই দক্ষিণের আলিপুর। খুব সচেতন ভাবেই বলব, কবির শেষনিঃশ্বাস আঁচল ভরে নিতে পেরে আলিপুর ধন্য হয়েছে, গর্বিত হয়েছে। আলিপুরের আত্মভূমি দুঃখ ও হতাশা, সাফল্য ও ব্যর্থতায় কম রক্তাক্ত হয়নি। সেখানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাপরিক্রমার শেষ পদচিহ্ন বুকে নিয়ে দক্ষিণের আলিপুর অমৃতকুম্ভের সোপান হয়ে উঠেছে। এই আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি কোন্ পথে এলেন ? যশোর থেকে কলকাতা কিংবা কলকাতা থেকে যশোর, এই পথ কবির জীবনে বেশ আপনজনেষু হয়ে ধরা ছিল। মাদ্রাজ, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স তাঁর মহাজীবনের পরিক্রমায় উল্লেখযোগ্য ভরকেন্দ্র হয়ে ধরা দিয়েছে। সে ইতিহাস নিতান্ত ছোট নয়। বিদেশ থেকে ব্যর্থ পরিতাপে তিনি স্বদেশে ফিরেছেন। দীর্ঘদিন মাদ্রাজে থেকেছেন। শেষপর্যন্ত তিনি জীবন নদীর অভিমুখ বড় দুঃসময়ে তিনি কলকাতার দিকে ঘুরিয়ে এনেছেন। সেই বৃত্তান্তটিও একটি সফল উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর পরলোকগমনের সার্ধশতবর্ষের (১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন - ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন) প্রাক্কালে বিষয়টি স্মরণ করবার যৌক্তিকতা আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের দ্বিশতবর্ষ ও পরলোকগমনের সার্ধশতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বিশেষ আয়োজনের প্রস্তুতি চোখে তেমন পড়ছে না। অথচ, বাঙালির সাহিত্যচর্চাকে বিশ্বমানের করে তুলেছিলেন, এই মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই তিনি বাঙালির মনোজগতে যুক্তি ও শৃঙ্খলার নৈকট্য এনেছিলেন। ধ্রুপদী সাহিত্যচর্চায় অন্তরঙ্গ মনোযোগ এনেছিলেন। বাঙালিকে শুধু নয়, ভারতীয় সাহিত্যকে তিনি এক বিশেষ উচ্চতায় স্থাপন করেছিলেন।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। তিনি শুধু নন, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটার জীবনেও নেমে আসে জীবনের রাজপথ থেকে বেরিয়ে মৃত্যুর দরজায় প্রবেশ করার আমন্ত্রণ। কতই বা বয়স তাঁদের। জীবনের কতটুকুইবা তাঁরা দেখেছেন। ভাবতে কষ্ট হলেও এটাই সত্য যে হেনরিয়েটা মাত্র সাঁইত্রিশ বছর কয়েক মাস বয়সে কবির আগেই চলে গেলেন। হাতেগোনা ঠিক তিনদিন পরেই চলে গেলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চিরকালের কীর্তিমান কবি, বিস্ময়ের বিস্ময় প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়েছিল (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ), রেবেকা ম্যাকটিভিস নামে এক ইংরেজ কন্যার সঙ্গে। মাত্র আটবছর স্থায়ী হয়েছিল তাঁদের বিবাহিত জীবন। তারমধ্যে কবি মধুসূদন দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছিলেন। বিবাহবিচ্ছেদের কিছুদিন পরেই তিনি এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামে এক ফরাসী তরুণীর সঙ্গে আরও একবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি মধুসূদনকে সারাজীবন সঙ্গ দিয়েছিলেন। এই হেনরিয়েটার

অকালপ্রয়াণ মধুসূদনের জীবনাবসানের ঠিক তিন দিন আগে। কাকতালীয়, নাকি এটাই ঈশ্বর চেয়েছিলেন, সে জবাব ঈশ্বরের নিকট পাওয়া যাবে। তবু এমন তরতাজা দুটি প্রাণ শিউলি ফুলের মতো যেন টুপ করে ঝরে গিয়েছিল। মধুসূদন ছিলেন, অমিতব্যয়ী। তাঁর খরচের কোনও বাপ-মা ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। তীব্র অর্থাভাবে কোনোদিক থেকে তিনি ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। স্বয়ং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে অনেকেই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মধুকবির প্রতিভার পৌরোহিত্য ততদিনে মধ্যগগনের সূর্যের মতো তেজোদীপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর জীবন প্রদীপের সলতে নিভে যাওয়ার জন্যে যেন প্রতীক্ষা শুরু করেছে। তিনি চাইলেও প্রদীপ যেন আর জ্বলতে চাইছে না। নিয়মনীতি শূন্য মদ্যপান, অনিয়মিত চিকিৎসা, নিজের ওপর অত্যাচারের ভার তাঁর শরীর আর বহন করতে পারছিল না। কপর্দক শূন্য কবি মধুসূদন শেষ জীবনে উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বাস করতেন। মধুসূদন দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাওড়ার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস বসাক একাধিক বার উত্তরপাড়ায় এসে মধুকবিকে দেখে যেতেন। তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, মধুকে দেখতে যখন শেষবার উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগারের কক্ষে যাই, তখন আমি যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখতে পাই, তা কখনো ভুলতে পারবো না। সে সেখানে গিয়েছিল হাওয়া বদল করতে। সে তখন বিছানায় রোগ যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিলো। মুখ দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিলো। আর তার স্ত্রী তখন দারুণ জ্বরে মেঝেতে পড়েছিলো। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মধু একটুখানি উঠে বসলো। কেঁদে ফেললো তারপর। তার স্ত্রীর করুণ অবস্থা তার পৌরুষকে আহত করেছিলো। তার নিজের কষ্ট এবং বেদনা সে তোয়াক্কা করেনি। সে যা বললো, তা হলো 'afflictions in battalions'। আমি নুয়ে তার স্ত্রীর নাড়ী এবং কপালে হাত দিয়ে তাঁর উত্তাপ দেখলাম। তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিম্নকণ্ঠে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমাকে দেখতে হবে না, ওঁকে দেখুন, ওঁর পরিচর্যা করুন। মৃত্যুকে আমি পরোয়া করিনে।

সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে হাওড়ার উত্তরপাড়া থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবার পরিকল্পনা করলেন, গৌরদাস বসাক। বাল্যবন্ধুর মধুসূদনের সপত্নীক এই আশঙ্কাজনক অবস্থা তিনি কিছুতেই মানতে পারলেন না। জানা গেল, মধুসূদন নিজেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। শেষমেষ প্রচন্ড অসুস্থ শরীরে জলপথে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন। মতান্তরে ২০ জুন। কলকাতায় ফিরে চৌরঙ্গীর লিন্ডসে স্ট্রিটে নিকট আত্মীয়ের বাড়ি ঠাঁই পেলেন, হেনরিয়েটা। মধুসূদনের থাকার কোনও জায়গা ছিল না। এন্টালির বাড়ি তিনি আগেই ছেড়ে গিয়েছিলেন। নানান টালবাহানা পেরিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে জায়গা পেলেন। সাধারণের প্রবেশ বেশ কঠিন ছিল, এই হাসপাতালে। মধুসূদনের সাহেবি পরিচয়ের বদান্যতায় এই হাসপাতালে ভর্তি হবার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর শরীর চিকিৎসায় ভাল সাড়া দিলেও অবনতির পারদ ক্রমে দুর্ভাগ্যের দিকে দৌড়তে শুরু করে। গলার অসুখ কিংবা প্লীহা কিছুটা সামাল দেওয়া গেলেও যকৃতের সিরোসিসের সংক্রমণ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। হৃদরোগের উপসর্গ বেশ প্রকটভাবে ঘনীভূত হয়েছিল। ফলে

শেষরক্ষা আর সম্ভব হল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জীবন প্রদীপের তেল ফুরিয়েছে, তারপরেও তিনি আশাবাদী ছিলেন, নতুন ভাবে জীবনের উপকূলে প্রত্যাবর্তন করবার তাগিদে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। নতুন করে সবকিছু শুরু করবার স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম লগ্নেও তিনি ধার করেছেন, নিজের জন্য নয়, অন্যের কাছে ধার নিয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা বশত শুশ্রূষাকারিণী নার্সকে বকশিশ দিয়েছেন। বিপন্ন অবস্থাতেও কবি আপন স্বভাব ও রুচি থেকে কখনও সরে দাঁড়াননি। তিনি ঋণ করেছেন, যিনি দিতে পারবেন, তাঁর কাছ থেকে। আর সংসারে যাদের দেওয়া দরকার তিনি চিরকাল উদার হস্তে তাদের দিয়ে গেছেন, কখনও কোনও অবস্থাতেই তিনি বিচলিত হননি।

আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি সপ্তাহখানেকের মতো চিকিৎসাধীন ছিলেন। সঠিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষা পেলেও তাঁর মনোবল একেবারে ভেঙে যায়, যখন তিনি জানতে পারেন, হেনরিয়েটা মারা গেছেন (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন)। চরম এই দুঃসংবাদ কবিকে কতখানি বিচলিত করেছিল, লিখে বলা যায় না। জীবনের শেষ ক'টা দিন একসঙ্গে থাকতে পারলে হয়তো তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন। নিজেকে একটু হলেও বোঝাতে পারতেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা শেষবারের মতো কলকাতায় ফেরার পর দু'জনকে দু-জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে। হেনরিয়েটার শেষকৃত্য কীভাবে হবে, কোথা থেকে আসবে তার খরচ, এইসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও অসুস্থ কবি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং ভগ্ন-হৃদয়ে জীবনের শেষ পরিণতির চক্রব্যূহ থেকে তিনি যে আর বের হতে পারবেন না, তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। মধুসূদন অল্পবয়সী দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও বড় অশান্তির মধ্যে ছিলেন। আসলে তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি, জীবনের অন্তিম অধ্যায় কী নিষ্ঠুর ভাবে লেখা হয়েছে। কিংবা তিনি নিজের অজান্তে নিজেই লিখেছেন, সেই কঠিন অধ্যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন-মৃত্যুর সমস্ত ব্যবধান ঘটিয়ে যখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী স্বীকারোক্তি আদায় করবার রীতি তাঁর ক্ষেত্রেও উপেক্ষা করা হয়নি। কিন্তু আপন কর্মফলের জন্যে বিধাতার কাছে তিনি যে মার্জনা চেয়েছিলেন, এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মুখে মুখে এমন কোনও কথাও প্রচারিত হয়নি। তবে তাঁর শেষকৃত্য কীভাবে হবে কিংবা তাঁর শেষকৃত্য নিয়ে বিতর্কের কোনও সূত্রপাত হতে পারে বলে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর সমাধি কোথায় হবে, তা নিয়ে অনেকেই বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। স্বয়ং মধুসূদন গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সত্ত্বেও জানিয়েছিলেন, "মানুষের তৈরি চার্চের আমি ধার ধারি নে। আমি আমার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি আমাকে তাঁর সর্বোত্তম বিশ্রামস্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন—আপনাদের দরজার সামনে অথবা গাছতলায়। আমার কঙ্কালগুলোর শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ না করে। আমার কবরের ওপর যেন গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস।" ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন বেলা দুটো নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য উত্তরাধিকার সূত্রে ততদিনে সাবালক হয়ে উঠেছে। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরও ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে।

মাইকেলের মৃত্যুর পর সম্ভাব্য আশঙ্কা চরমভাবে সত্য হয়ে দেখা দিল। তার শেষ বিদায়ের তৎকালীন খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর সমাধি করবার জায়গাটুকু পর্যন্ত না দেওয়ার তীব্র চক্রান্ত হল। তাঁর মৃত্যুর খবর উল্লেখযোগ্য তেমন কোথাও ছাপা হল না, তিনি যেন অপাঙক্তেয় কেউ। মিশনারীদের সংবাদপত্র ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া তাঁর মৃত্যুর খবর অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করে মর্যাদা দিল, না উপেক্ষা করল বোঝা গেল না। হিন্দুসমাজের কাছ থেকেও তিনি চরম অবহেলা পেলেন। তাঁর অকালমৃত্যু সেই অবহেলা প্রতিরোধ করতে পারেনি। খ্রিষ্টান সমাজের অসযোগিতা ও অনমনীয় মানসিকতার জন্যে কবির মরদেহ দুর্গন্ধে ভরা মর্গে পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল। তিনি সযত্ন আতিথেয়তা মৃত্যুর পরেও পেলেন না। জীবন-সমুদ্র মন্থনে অমৃত ও গরল ঠিক কতখানি উত্থিত হয়, তা কবির মৃত্যু ইতিহাস ঘাঁটলে বেশ উপলব্ধি করা যায়। হিন্দুসমাজের বিরোধিতায় কবি গঙ্গার ঘাটেও আশ্রয় পেলেন না। দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের সৌজন্যে গঙ্গার ঘাটে কবির মরদেহ পড়ানোর অমর চেষ্টা করেও সফল হওয়া গেল না। কবি মধুসূদনের মর্গে পচতে থাকা লাঞ্ছিত মরদেহ একজন অসীম সাহসী ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজকের সহায়তায় বিশপের কোনও অনুমতি ছাড়াই সার্কুলার রোডের খ্রিস্টান গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। কয়েকদিন পূর্বেই তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটাকেও এই সমাধি-উদ্যানে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। দু'জনকে একেবারে পাশাপাশি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হেনরিয়েটার সমাধির পাশেই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে গভীর শান্তিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপরেও বিতর্ক থামেনি, লন্ডনের ইন্ডিয়া কার্যালয়ের গ্রন্থাগারে চার্চের রেজিস্ট্রারে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা সোফিয়ার সমাধিস্থ করার কোনও নথি নেই। অথচ প্রায় দুইশত বছর ছুঁয়ে যাওয়া পৃথিবীর মানব-হৃদয়ে কবি মধুসূদনের জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আজও পরম অর্থবহ হয়ে জেগে আছে। স্বর্ণাক্ষরে লেখা নাম নয়, তার চেয়েও অমূল্য কোনও বস্তু দিয়ে তাঁর নাম লেখা হয়েছে, বাঙালি জীবনে। ভারতীয় সাহিত্যের কোজাগর-ভূমিতে। তাই, সূর্যোদয়ের আর এক নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সুচেতনার যে বিশেষ সংকলনগুলি অল্প পরিমাণে এখনও পাওয়া যায়

মানবতা (৭), বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান (৮), সন্দেহ (১২), স্বার্থপরতা বনাম স্বার্থত্যাগ (১৬), বাংলা গান, বাংলার গান (২২), ছোটোগল্প (৩০), দেয়ালপত্রিকা (৩৪), পুতুলনাচ (৩৫), জটারদেউল (৪০), বিষহরি মনসা (৪১) সাঁকো সেতু ব্রিজ (৪৩), মহিরুহ বটবৃক্ষ (৪৭), অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী (৪৮), সুচেতনা চলতে চলতে রজতজয়ন্তী বর্ষে ... জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিশেষ সংখ্যা (৪৯ ও ৫০), সুন্দরবনকেন্দ্রিক শতাব্দীপ্রাচীন বিস্মৃত উপন্যাস কুমুদানন্দ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (৫১)

ডোকরা শিল্প সামগ্রী

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রানী পুতুল

ISBN : 978-93-94804-05-0

9 789394 804050

Published by : Rajgarah Sahitya Sanskriti Chakra, Editor : Goutam Mondal,
Printed by : Suchetana Printing & Publishing, Gocharan, South 24 Parganas